দর্শনায় দুই তেল পাম্পে পেট্রোল সংকট, ভোগান্তিতে মোটরসাইকেল চালকরা

দর্শনার দুটি তেল পাম্পে পেট্রোল সংকটের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন মোটরসাইকেল চালকরা। প্রতিদিন কিছুসংখ্যক মোটরসাইকেল পেট্রোল পেলেও শত শত মোটরসাইকেল পেট্রোল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

দর্শনা তেল পাম্পে পেট্রোল আসার খবর পাওয়া মাত্রই শত শত মোটরসাইকেল পাম্পে লাইন দেয়। পাম্প মালিকদের দাবি, ডিপো থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পেট্রোল না পাওয়ায় এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

তেল পাম্প মালিকরা জানান, আগে যেখানে ডিপো থেকে সাড়ে ৪ হাজার লিটার পেট্রোল সরবরাহ করা হতো, এখন সেখানে দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৩ হাজার লিটার। ফলে প্রতিদিন প্রায় ১ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রোলের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে। আগে ৪ থেকে ৫ দিন পরপর পেট্রোল আনতে হতো, এখন ৩ হাজার লিটার পেট্রোল ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

পেট্রোল সরবরাহের সময় পুলিশের সহায়তায় পাম্পে পেট্রোল বিক্রি করা হচ্ছে। পেট্রোল শেষ হয়ে গেলে ‘তেল নেই’ লেখা ব্যানার টানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অন্যদিকে, অনুসন্ধানে জানা গেছে, এলাকায় অবৈধভাবে চড়া দামে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। পারকৃষ্ণপুর গ্রামের একটি দোকানে ঈদের পরদিন (২১-০৩-২০২৬) ৩০০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রি নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এছাড়া আকুন্দবাড়িয়া তমালতলা এলাকায় ২৮০ টাকা, সাড়াবাড়িয়া চাররাস্তার মোড়ে ২০০ টাকা এবং প্রতাপপুর এলাকায় ২৬০ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয়দের দাবি, কিছু অসাধু মোটরসাইকেল মালিক পাম্প থেকে পেট্রোল সংগ্রহ করে ১৫০ থেকে ১৮০ টাকা দরে দোকানদারদের কাছে বিক্রি করছে। এরপর সেই পেট্রোল বিভিন্ন দোকানে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে, যার ফলে সংকট আরও তীব্র হচ্ছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় ভুক্তভোগীরা বলেন, অসাধু বিক্রেতাদের

জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবাইদুর রহমান সাহেল বলেন, কোথায় কোথায় অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে তার তথ্য দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের নতুন দরবেশপুর স্কুল মাঠে পানি জমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বৃষ্টির পানি জমে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

এলাকাবাসীর একমাত্র খেলার মাঠটি এই বিদ্যালয়ের মাঠ হওয়ায় স্কুল শেষে গ্রামের শিশুরা এখানেই খেলাধুলা করে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সঠিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই মাঠে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে যায়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, প্রতিদিন সকালে বাচ্চাদের ক্লাসে নেওয়া ও ছুটির সময় বের হওয়া দুটোই এখন কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঠজুড়ে পানি জমে থাকায় পায়ে কাদা লেগে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করছে। এতে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং রোগজীবাণু ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়ছে।

এলাকার অভিভাবক ও স্থানীয়রা জানান, নতুন দরবেশপুরে খেলার জন্য এ মাঠটি ছাড়া আর কোনো উন্মুক্ত স্থান নেই। বাচ্চারা খেলতে না পারায় তারা হতাশ হয়ে পড়ছে।

স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী খন্দকার ওভি (১০) বলেন, সকালে আমরা স্কুলে আসি আর বিকেল ৪টায় ছুটি হয়। এর মাঝে টিফিন থাকে। খেলার মাঠ ভালো থাকলে তোমরা খেলা করতে পারতাম, কিন্তু এখন আর পারছি না। যাতায়াতের সময়ও পানির ভেতর দিয়ে আসা-যাওয়া করতে হয়। এর

ফলে আমার অনেক সহপাঠী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তারা ক্লাসে উপস্থিত হতে পারছে না। আমাদের এই সমস্যার দ্রুত সমাধান চাই।

ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোছা: খাইরুন নেছা বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত আছি। প্রতি বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতেই বিদ্যালয়ের মাঠ ও প্রাঙ্গণে হাঁটু পর্যন্ত পানি জমে যায়। ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সবাই চরম ভোগান্তিতে পড়ে।

আমরা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সমস্যার সমাধানে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করে আসছি। উপরমহল থেকেও আমাদের জানানো হয়েছে যে খুব শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান হবে। তবুও আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি জোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

এ বিষয়ে এলাকাবাসী ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, দ্রুত মাঠের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ও মেরামত করা জরুরি। সময়মতো পদক্ষেপ নেওয়া না হলে মাঠটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়বে।
উপজেলা প্রশাসন, স্থানীয় সরকার এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগে মাঠের পানি নিষ্কাশন ও সংস্কারকাজ দ্রুত শুরু করলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও এলাকার শিশু-কিশোরদের বড় একটি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে।

গাংনীর সাহারবাটী ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নানা ভোগান্তি

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে আতিকুর রহমান যোগদানের পর থেকে বেড়েছে সেবা প্রত্যাশীদের হয়রানী বেড়েছে কয়েকগুণ। খাজনা পরিশোধের অনুমোদন না পেয়ে ভুমি মালিকদের ঘুরতে হচ্ছে দিনের পর দিন। এতে একদিকে যেমন মানুষের হয়রানী বেড়েছে,অন্যদিকে সরকার হারাচ্ছে রাজস্ব। অফিসে সাংবাদিক প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা দেন তহশিলদার আতিকুর রহমান।

সেবা প্রত্যাশীদের অভিযোগ নামজারী অনুমোদন নিতে হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ। এক সপ্তাহেও পাচ্ছে না অনুমোদন বা নাগরিক সেবা।

নামজারি রিপোর্টের জন্য ২০০ টাকা, ও হোল্ডিং খুলতে নেওয়া হচ্ছে ২০০ টাকা,নামজারি করে দেওয়ার নামে নেওয়া হচ্ছে ২ হাজার ৫০০ টাকা, ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার দুপুর ১২ টার সময় অফিসে গেলে সাংবাদিক প্রবেশে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিয়ে যেতে হবে বললেন আতিকুর রহমান,অফিসের সব কাজ ফেলে রেখে তিনি মোবাইল ফোনে ব্যস্ত।

অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, ধর্মচাকী গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে প্রবাস ফেরত সাইফুল ইসলাম জানান,আমি একটি হোল্ডিং খোলার জন্য দুই সপ্তাহ ধরে ঘুরছি, এছাড়াও আমি বিবিধ ১৫১/১৩/১৫০ নামজারী বাতিল পৃর্বক সংশোধনের জন্য ১ বছর ধরে ভুমি অফিসে ঘুরে ঘুরে অবশেষে ২৩/০৭/২০২৫ ইংরেজি তারিখে সহকারী কমিশনার ভূমি সাদ্দাম হোসেন সমস্ত কাগজপত্র দেখে উভয় পক্ষের শুনানি মোতাবেক নামজারী বাতিলের নির্দেশ দেন।

আদেশ পাওয়ার দুই মাস অতিবাহিত হলেও সহকারী ইউনিয়ন ভুমি কর্মকর্তা আতিকুর রহমান, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কর্মকর্তার নির্দেশ উপেক্ষা করে আমাকে আজ কাল করে হয়রানি করে আসছ, আমি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।
ভুক্তভোগী ধর্মচাকী গ্রামের অসহায় প্রতিবন্ধী শামসুল ইসলাম জানান, আমি তিন মাস ধরে এই অফিসে ঘুরছি আমার কাছ থেকে নামজারির জন্য আড়াই হাজার টাকা নিয়েছে এই অফিসের লোকজন, তিন মাস পরে এসে বলছে আপনার কাজ হয়নি বলে হয়রানি করছে।

আমি প্রতিবন্ধী,চলতে পারিনা তাও আমাকে ঘুরাইতেছে। তিনিও উপজেলা প্রশাসনের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, ভুমি অফিসে সেবা নিতে আসা চৌগাছা গ্রামের একজন দলিল লেখক নজরুল ইসলাম জানান, আমি জমির খাজনা দেওয়ার জন্য অনলাইন করেছি, শুধু অনুমোদন নিতে এক সপ্তাহ লাগবে, বললেন আতিকুর রহমান। সাত দিন পরে অফিসে যাওয়ার পরামর্শ দেন।এভাবেই চলছে ভূমি সেবা।, ভুক্তভোগীরা জানান,আসলে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। এ কারণেই দুর্নীতি বেশি হচ্ছে। জনগণের টাকায় বেতন নিয়ে জনগণকে হয়রানি করছে। এই ঘটনা তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার অনুরোধ করেন তারা।

উপজেলা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের কৃষক এনায়েত আলী জানান,আমি হোল্ডিং খোলার জন্য এর আগে দুই দিন অফিসে এসেছি হয়নি, আজকেও এসেছি আতিকুর রহমান বলছে, পরে আসেন সিরিয়াল মোতাবেক হবে এই বলে আমাকে বের করে দিয়েছে দেখা যাক কি হয়, আজ না হলে আবারো আশা লাগবে, এভাবে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। এর আগে হোল্ডিং খুলতে ২০০ টাকা, নামজারীর রিপোর্ট দেওয়ার জন্য ৩০০ টাকা করে নিতো। আজকে কত নিবে জানিনা।

নামজারী অনুমোদন, খাজনার রশিদের জন্য অনুমোদন, নিতে হয়রানি করা হচ্ছে সাংবাকিকের এমন প্রশ্নের জবাবে ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমান বলেন, আপনাদের অফিসে ঢোকার পারমিশন কে দিয়েছে,? ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ নিয়ে তারপর অফিসে আসবেন,তখন কথা বলবো। তথ্য নিতে গিয়ে এমন বিড়ম্বনায় পড়েন গাংনীর দুই সাংবাদিক।

হোল্ডিং খোলা হচ্ছে না হয়রানি করা হচ্ছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপনারা এসিল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করেন। বার বার অনিয়মের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন কথা বলতে রাজি হননি বরং সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণ করেন।

এ ব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, আমি একটি মিটিংয়ে রয়েছি পরে কথা হবে।

জলাবদ্ধতায় তলিয়ে গেছে কয়েক হাজার বিঘা জমির ফসল

প্রায় দুই মাসের টানা বর্ষণে ডুবে গেছে মেহেরপুরের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে হাজার হাজার বিঘা জমির আউশ ও আমন ধান, কলা, মরিচ ও শীতকালীন সবজির ক্ষেত। ভেসে গেছে মাছের ঘেরও। এতে যেমন দেখা দিতে পারে খাদ্য সংকট, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে বড় ধাক্কা খেতে হচ্ছে কৃষকদের।

কৃষকরা বলছেন, মাঠের পানি দ্রত না নামলে শুধু এবারের নয়, আগামী মৌসুমের ফসলও বুনতে পারবেনা কৃষকরা। এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তারা। সেই সাথে দেখা দিতে পারে জেলার খাদ্য ঘাটতি।”দীর্ঘ জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এখন সরকারি সহায়তার অপেক্ষায়।

মেহেরপুর জেলার সর্ব বৃহৎ ধলার মাঠ। যতদুর দৃষ্টি যায় শুধু ফসল আর ফসল। সেই মাঠে এখন শুধুই পানি। পাকা ধানসহ বিভিন্ন ফসল এখন পানেও নিচে। দুই মাসের অধিক সময় ধরে অবিরাম বর্ষণ হয়েছে।

এতে জেলার বিভিন্ন স্থানের মতো গাংনী উপজেলার ধলার মাঠটিতে কোথাও হাটু পানি, কোমর পানি, আবার অনেক জায়গায় বুক পানি। এই পানি না গেলে কৃষক ফসলও তুলতে পরবেননা, আগামি মৌসুমেও ফসল বুনতেও না পারার আশংকা করছেন তারা।

মেহেরপুর জেলার সর্ববৃহত ধলার মাঠে গিয়ে স্বরেজমিনে দেখা গেছে-সবজিক্ষেতের অধিকাংশ গাছ পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাকা ধান পানির নিচে ডুবে থাকায় আগাম কেটে ফেলতে হচ্ছে কৃষকদের। আর কলাক্ষেতে পানি আরও কিছুদিন থাকলে সেটিও মারা যাবে বলে আশঙ্কা। পানি জমে থাকায় ফসল তোলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। যেখানে আগে গরু বা মহিষের গাড়িতে ফসল আনা যেত, সেখানে এখন ডিঙি নৌকা ব্যবহার করতে হচ্ছে কৃষকদের।

সময়মতো পানি না কমলে এ অঞ্চলে তীব্র খাদ্য সংকটের শঙ্কা করছেন তারা। খাল খনন ও কাজলা নদীতে পানি প্রবাহের জন্য কালভার্ট নির্মানের মাধ্যমে পানি নিস্কাশন করে কৃষিতে সহায়তা করা এখন সময়ের দাবী।

আমন ধান চাষি ধলাগ্রামের ইয়াকুব আলী জানান, এবার তিনি ৪ বিঘা জমিতে আমন ধানের আবাদ করেছেন। এখন ধান কাটা মাড়াইয়ের সময়। এমন মুহুর্তে পানিতে আমার জমির সব ধান ডুবে গেছে। বেশিদিন পানির নিচে থাকলে ওই ধান আর ঘেও তোলা যাবেনা। মাইলমারি গ্রামের কৃষক ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, দ্রত পানি না সরলে এবার যেমন ফসল ঘেও তুলতে পারছিনা,তেমনি আগামী ফসলও লাগাতে পারবোনা । ফলে পরিবারে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে। নওপাড়ার কৃষক মনিরুল ইসলাম বলেন, ধালার মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য খাল খনন করা হয়েছেছিল। কিন্তু কালভার্ট না দেয়ায় মাঠের এক দিকের পানি নিস্কাশন হয়,অন্যদিকে পানি নিস্কাশন হতে পারেনা। এছাড়া খালে পাট জাগ দেয়ার কারনে পানি

প্রবাহ বন্ধ হওয়ায় দির্ঘদিন জলাবদ্ধতায় নিমজ্জিত থাকে পুরো মাঠ। যা অন্তত ১০ গ্রামের মানুষের আবাদ নস্ট হচ্ছে।

” তবে, কৃষি বিভাগের দাবি “ বৃষ্টিতে তলিয়ে যাওয়া ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন কৃষি বিভাগ। কৃষকদের অভিযোগ হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল পানির নিচে থাকলেও এমন দুর্যোগে পাশে নেই কৃষি বিভাগ।

জেলার এবছর ২৩ হাজার হেক্টর জমিতে আউশ ও ২৬ হাজার জমতে আমনের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি আউশ ও আমানের আবাদ হয়ে থঅকে এই ধলার মাঠে। ফসল তলিয়ে যাওয়ায় জেলায় খাদ্য সংকটের আশঙকা করছেন চাষিরা।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইমরান হোসেন বলেন, বৃষ্টিতে তলিয়ে যাওয়া ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন কৃষি বিভাগ। সেই সাথে পানি নিস্কাশনের জন্য খাল খনন কিংবা কালভার্ট নিমানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপন অধিদপ্তরকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা শহর ঘেঁষা আসাননগরে ভোগান্তি ; কাঁচা রাস্তা ডুবে আছে কাদায়

আলমডাঙ্গার শহরতলির আসাননগরে স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। কাঁচা রাস্তায় নিত্যকাদায় ডুবে মানবেতর জীবন করছে।অসুস্থ রোগী, শিক্ষার্থী ও লাশ পর্যন্ত আটকে পড়ে ঘরে!

আলমডাঙ্গা শহরের কোলঘেঁষা আসাননগর গ্রামের মানুষ যেন বঞ্চনার আরেক নাম। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও এখানকার প্রধান রাস্তাটি এখনো কাঁচা। ফলে গ্রামের পাঁচ হাজার মানুষ বছরের বেশিরভাগ সময় কাটান কাদাপানিতে হেঁটে, পা পিছলে পড়ে, অসুস্থতা আর ক্লান্তির বোঝা নিয়ে।

গ্রামটির পশ্চিম ও উত্তরে জিকে সেচ খাল, দক্ষিণ ও পূর্বে কুমার নদী থাকায় আসাননগর গোলাকৃতি একটি দ্বীপগ্রামের মতো—বাইরে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা একটি রাস্তা, সেটিও এখন চলাচলের অনুপযোগী। বর্ষায় রাস্তার ওপর জমে থাকে হাঁটুসমান কাদা-পানি। এ যেন এক দুঃসহ যাত্রাপথ।

এই গ্রামের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন কষ্ট করে কাদাপানি মাড়িয়ে স্কুলে যায়। কোনো রিকশা বা ভ্যান ঢুকতে না পারায় পায়ে হেঁটে যেতে হয় দূরের স্কুল-কলেজে। শিশু শিক্ষার্থীদের স্কুল ইউনিফর্ম ভিজে কাদায় নোংরা হয়, অনেকে প্রায়ই পড়ে গিয়ে আহত হয়।

অপরদিকে, রোগীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আসাননগর গ্রামের গৃহবধূ রওশন আরা বলেন, “আমার শাশুড়ির হঠাৎ অসুস্থ হলে ভ্যানে করে হাসপাতালে নিতে পারিনি। কাঁধে করে কাদা ভেঙে বাইরে নিয়ে যেতে হয়েছে। ভ্যানও ঢুকতে চায় না, চালকরা বলে, ওখানে গেলে চাকার অর্ধেক ডুবে যায়।”

স্থানীয় বাসিন্দা হানিফ শেখ বলেন, “কোনো মানুষ মারা গেলে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়াটাই এক যুদ্ধ। খাটিয়া বহন করে কাদা মাড়িয়ে যেতে হয়। বর্ষায় জানাজায় ১০-১৫ জনের বেশি লোক অংশ নিতে পারে না।”

মসজিদ, ঈদগাহ ও গোরস্থানে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটিও এই কাঁচা পথ। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও দেখা দেয় সীমাহীন দুর্ভোগ। বর্ষায় রাস্তাটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন মনে হয়, এই গ্রাম যেন পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ।

আসাননগরের লোকজন বলেন, নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা নিয়মিত আসেন, নানা প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নির্বাচন শেষ হলে তারা আর ফিরেও তাকান না। স্থানীয় বাসিন্দা আজিম উদ্দিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, “প্রতিবার আমরা আশায় থাকি এবার কিছু হবে। চেয়ারম্যানরা শুধু ভোটের সময় বলে, এরপর আর কেউ খোঁজও নেয় না।”

সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের বিষয় হলো, শহরের এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রামে নেই কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নেই কোনো পাকা ড্রেনেজ ব্যবস্থা। অথচ আশপাশের গ্রামগুলোতে একের পর এক রাস্তা পাকা হয়েছে। আসাননগর গ্রাম যেন উন্নয়ন মানচিত্রে ভুলে যাওয়া এক অঞ্চল।

স্থানীয় মেম্বার বা চেয়ারম্যানের কাছেও গেলে তারা বলে, বরাদ্দ নেই, অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এ অপেক্ষার যেন কোনো শেষ নেই। গ্রামের মানুষ মনে করেন, একটি পাকা রাস্তাই তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রথম ধাপ। তারাই চান—জরুরি ভিত্তিতে অন্তত মসজিদ, গোরস্থান ও ঈদগাহে যাওয়ার সড়কটি পাকা হোক।

আসাননগর গ্রামের বাসিন্দারা সরকারের উচ্চ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, “আমরা রাস্তাই চাই, আর কিছু না। অন্তত একজন মানুষ মারা গেলে যেন ঠিকমতো জানাজা দেওয়া যায়, শিশুরা যেন ভিজে কাদা ডিঙিয়ে স্কুলে না যায়, আর অসুস্থ রোগী যেন কাঁধে নয়, ভ্যানে করে হাসপাতালে যেতে পারে।”

এই চরম দুর্ভোগ থেকে কখন মুক্তি মিলবে—সে প্রশ্নই এখন আসাননগরবাসীর হৃদয়জুড়ে।

ঝিনাইদহে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, ভোগান্তিতে কর্মজীবী ও শ্রমিকরা

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে ঝিনাইদহে সকাল থেকেই থেমে থেমে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হঠাৎ এমন আবহাওয়ায় জনজীবনে নেমে এসেছে স্থবিরতা।

বৃষ্টির কারণে শহরের ব্যস্ত সড়কগুলো হয়ে পড়েছে ফাঁকা। প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। যারা বের হয়েছেন, তারা ছাতা ও রেইনকোট ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করছেন। তবে যানবাহনের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া দিনমজুর, রিকশাচালক ও ফুটপাতের ব্যবসায়ীরা। সকালে শহরের পায়রা চত্বর এলাকায় দেখা যায়, অনেক রিকশাচালক অলস বসে সময় কাটাচ্ছেন।

রিকশাচালক মিজানুর রহমান বলেন, “সকালে বের হইছি রিকশা নিয়ে, কিন্তু যাত্রী নাই। বৃষ্টি আর ঠাণ্ডা বাতাসে কেউ রাস্তায় বের হচ্ছে না। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত ঠিকমতো ভাড়া পাইনি। বৃষ্টির দিনে ঘরে বসে থাকলে তো পেট চলবে না, তাই নামছি রাস্তায়।”

কাপড় বিক্রেতা মনোয়ার হোসেন বলেন, “এই রকম আবহাওয়ায় ক্রেতা আসে না বললেই চলে। বৃষ্টির কারণে দোকান খুলেও বসে থাকতে পারছি না। সকাল থেকে বিক্রি করতে পারিনি। কষ্টের মধ্যে আছি।”

চায়ের দোকানদার মানিক মিয়া বলেন, সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। দোকানে কেনা-বেচা খুবই কম। তবু দোকান খুলে বসে থাকি, যদি কিছু বেচা যায়।”

এদিকে শহরের নিচু এলাকাগুলোতে কোথাও কোথাও পানি জমে গেছে। কাদা ও ভেজা রাস্তায় চলাচলে ভোগান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

তামাকে গিলছে ভর্তুকির সার

মেহেরপুরে তিব্র রাসায়নিক সার সংকট তৈরি হয়েছে। সার পেতে কৃষকদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। তবে এই সার সংকট তৈরি হয়েছে অতিমাত্রার তামাক চাষ ও অত্যাধিক ডিএডপি সার ব্যবহারের কারণে বলে জানিয়েছে কৃষি অধিদপ্তর ।

চলতি রবি মৌসুমে মেহেরপুরে ২৫ হাজার হেক্টর কৃষি জমিতে তামাক চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। গত বছরেও ২৬ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ হয়েছিলো। পরিবেশবান্ধব টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) সারে ভর্তুকি দেওয়া হলেও সেই সুবিধা নিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা পাওয়ায় তামাক চাষে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠছেন কৃষকরা।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি কেজি ইউরিয়া সারের বর্তমান দাম ৪৮ টাকা, ডিএপি ৭০, টিএসপি ৫০, এমওপি ৬০ টাকা। ৫ টাকা দাম বৃদ্ধির পরও সরকারকে এখন প্রতি কেজি

ইউরিয়ায় ২১ টাকা, ডিএপিতে ৪৯ টাকা, টিএসপিতে ২৩ টাকা ও এমওপিতে ৪০ টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের বাসিন্দা কৃষক মোফাজ্জেল হোসেন । চলতি মৌসুমে তিনি ১১ বিঘা জমিতে তামাক চাষ করছেন। মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, “আমি দুটি তামাক কোম্পানির তালিকাভুক্ত চাষি। প্রতি বিঘা জমিতে তামাক চাষের জন্য কোম্পানি থেকে আমাদের শুধুমাত্র রাসায়নিক সার হিসাবে সালফেট অব পটাশ (এস ও পি) ও বাজার থেকে অন্যান্য সার কেনার জন্য নগদ টাকা দেওয়া হয়েছে। আমার ১১ বিঘা জমিতে ১১০ বস্তা ডিএপি, ২২ বস্তা এমপি, ২২ বস্তা ইউরিয়া, ১১ বস্তা সালফেট প্রয়োজন পড়বে।

একই এলাকার কৃষক জহুরুল ইসলাম বলেন, আমার ৬ বিঘা জমিতে ফুল কপির চাষ করেছি। এই ৬ বিঘা জমিতে টিএসপি, ৬ বস্তা, ডিএপি ৬ বস্তা, এমপি ৩ বস্তা, ইউরিয়া ৩ বস্তা। কিন্তু চলতি মৌসুমে চাহিদা অনুযারী কোন সার পাওয়া যায়নি। সারের অভাবে ফুল কপি সময়মত বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এবারে বড় আকারের লোকশানে পড়তে হবে।
গত বছরে নভেম্বর মাসে ডিএপির মোট বরাদ্দ ছিলো ১ হাজার ৯৯৩ মেট্রিকটন। চলতি মৌসুমে ১ হাজার ৫১৭ মেট্রিকটন।
জানতে চাইলে বিসিআইসির ডিলার মিরাজুল হক বলেন, কৃষকেরা সবজি চাষের নামে তামাক চাষে ডিএপি ব্যবহার করছে। এই কারণে ডিএপি সারের সংকট দেখা দিয়েছে। সবজি চাষে তামাক চাষের মত অতিরিক্ত সারের প্রয়োজন পড়ে না। কোন কৃষক কোন ধরনের ফসলের চাষ করছেন তা জানার উপায় থাকে না।

একই এলাকার কৃষক ছাদের আলী । তিনি বলেন, “ডিএপি সার হলো তামাকের প্রাণ। এটি ব্যবহার না করলে তামাকের ভালো ফলন পাওয়া যায় না।” তামাক কোম্পানিগুলো এর আগে সব রকমের সার দিতো। বর্তমানে শুধু মাত্র এস ও পি সার সরবারহ করে। এমওপি, ডিএপি সার এলাকার ডিলারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। বর্তমানে বিশেষ করে ডি এপি সারের চরম সংকট তৈরি হয়েছে। একজন কৃষককে ৫০ কেজির বেশি ডিএপি সার দেওয়া হচ্ছে না। সারের যোগান দিকে কৃষকদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ সামছুল আলম বলেন, মেহেরপুরে তামাকের চাষ হচ্ছে দির্ঘদিন থেকে। সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে তামাক চাষে কৃষকদের অনুৎসাহিত করার জন্য। কিন্তু তামাক কোম্পানির নানান সুবিধার জন্য কৃষকদের মধ্যে তামাক চাষ কমানো সম্ভব হচ্ছে না। বর্তমানে ডিএপি সারের চাহিদা বেড়েছে কয়েকগুন শুধুমাত্র তামাক চাষের কারণে।

সবজি,ধান,পাট, গম,পেঁয়াজ, রসুন, আলু চাষে নির্দিষ্ট পরিমানে সার ব্যবহার হয়। অন্যদিকে শুধুমাত্র তামাক চাষে বিঘা প্রতি ৫০০ কেজি ডিএপি সার ব্যবহারের প্রবনতা তৈরি হয়েছে কৃষকদের মাঝে। একারণে অন্যান্য ফসলের জন্য সার পাচ্ছেন না কৃষকেরা।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি বিদেশি তামাক কোম্পানির প্রতিনিধি বলেন, তামাক কোম্পানি কৃষকদের তামাক চাষে সুবিধবার জন্য এসওপি সার বিদেশ থেকে আমদানি করে সরবারহ করে। ডিএপি, এমওপি, ইউরিয়া, জিপসাম সার বাইরে থেকে কেনার জন্য নগদ টাকা দেওয়া হয় ।

সরকারি সার সুপারিশ নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে, এক বিঘা ফুল কপির জমিতে ২৯ কেজি ইউরিয়া, ৩৩ কেজি টিএসপি, ১২ কেজি এমওপি সার ব্যবহার করতে হবে। অন্যদিকে একই জমিতে যদি তামাক চাষ করা হয় সেখানে কৃষকেরা বিঘা প্রতি জমিতে শুধুমাত্র ডিএপি ৫০০ কেজি ব্যবহার করছেন। ইউরিয়া ৫০ কেজি, এমওপি ৫০ কেজি ব্যবহার করতে হচ্ছে।
কৃষি কর্মকর্তারা বলছেন, সরকারি ভর্তুকির সার চলে যাচ্ছে তামাক চাষে। অন্যান্য গুরুত্বপর্ণ ফষলের জন্য সার মিলছে না বাজারে। সরকারি ডিলারদের বরাদ্দের চেয়ে বেশি পরিমানে সারের প্রয়োজন পড়ছে শুধুমাত্র তামাক চাষের জন্য। কিন্তু সরকার তামাক চাষের জন্য কোন প্রকারের সারের বরাদ্দ দেয়না।
জেলা সার ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, মেহেরপুরে রবি মৌসুমে তামাক চাষের কারণে সার সংকট তৈরি হয়। তামাকে অধিকমাত্রায় সার ব্যবহারের কারণে সবজিসহ অন্যান্য ফসলের জন্য কৃষকদের সার পেতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ করা গেলে সার সংকট তৈরি হবে না।

জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি মাসে বিএডিসি ও বিসিআইসি থেকে জেলাতে ইউরিয়া বরাদ্দ ছিলো ৩ হাজার ৯৬৪ মেট্রিকটন, টিএসপি ১ হাজার ৭৮১ মেট্রিকটন, ডিএপি ২ হাজার ৪৫২ মেট্রিকটন, এমওপি সার বরাদ্দ ছিলো ১ হাজার ৮২৪ মেট্রিকটন। চলতি মৌসুমে ভুট্টার চাষ হয়েছে ১৭ হাজার ৪৫০ হেক্টর জমিতে, গম ১ হাজার ৩৬৫ হেক্টর, বোরো ধান রয়েছে ১৯ হাজার ২৬৫ হেক্টর, পেঁয়াজ রয়েছে ৪ হাজার ৫৬৫ হেক্টর, বিভিন্ন সবজি ৩ হাজার ৫৬০ হেক্টর জমিতে।
মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে, এ বছর ২৫ হাজার হেক্টর জমিতে তামাক চাষ ছলছে। যা গত বছরে ছিলো ২৬ হাজার হেক্টর।

সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের বাসিন্দা প্রান্তিক কৃষত হাসেম

মিয়া বলেন, আমাদের এই এলাকায় সবজি চাষ বেশি হয়ে থাকে। ঠিক এই সময়ে এসে তিব্র সারের সংকট দেখা গেছে। আমার ৫ বিঘা ফুল কপি আর বাধাকপি রয়েছে। সারের সংকটে এখনো চাহিদা মোতাবেক সার সংগ্রহ করতে পারিনি। যদিও এলাকার কয়েকটি দোকানে বেশি দামে সার পাওয়া যাচ্ছে।

একই এলাকার বাসিন্দা কৃষক মাজেদুল ইসলাম বলেন, ডিলারের দোকানে গেলে বলে সার নেই। এলাকার দোকানে ১ হাজার ৫০ টাকার ডিএপি সার ১ হাজার ৫০০ টাকা দামে কিনতে হচ্ছে। গত ১৬ বছর ধরে একই রকম দামে আমাদের সার কিনতে হচ্ছে।
সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সারাফাত হোসেন বলেন, “এলাকায় খুচরা পর্যায়ে সার পাওয়া যায়। তবে ফসফেট, পটাশ, ড্যাপের দাম বস্তাপ্রতি ৩০০ টাকা বেশি পড়ে। চলতি মৌসুমে দাম বেশি দিয়ে ও সার পাওয়া যাচ্ছে না”।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ইমরান হোসেন বলেন, “কৃষি কর্মকর্তারা কখনোই তামাক চাষে কৃষকদের পরামর্শ দেন না। বরং তামাক চাষ থেকে কৃষকদের বের করে আনার পরামর্শ দেন। প্রতি বিঘা জমিতে তামাক চাষে কী পরিমাণ সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে সেই পরামর্শ তামাক কোম্পানির কৃষিবিদরা দিয়ে থাকেন।” তামাক চাষের কারণে সবজি সহ অন্যান্য ফসলের সার পেতে কৃষকদের ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছ “।

জেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরে উপপরিচালক বিজয় কৃঞ্চ হালদার বলেন, “ তামাক চাষ কৃষি জমি ও পরিবেশের জন্য মারাত্তক হুমকি। তামাক চাষে কৃষকদের নানাভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের দুইটি লিফট একসাথে নষ্ট চরম ভোগান্তিতে রোগীসহ স্বজনরা

সেলিনা বেগমের শ্বশুর অসুস্থ। হাসপাতালের ৬ষ্ঠ তলায় তার অবস্থান। প্রতিনিয়ত নিচে ওঠানামা করতে হয়। কিন্তু রোববার থেকে হাসপাতালের

বহুতল ভবনরে দুইটি লিফট এক সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে। এ নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন তিনি। শুধু সেলিনা বেগন নয়, তার মতো শতাধীক রোগী ও রোগীর স্বজনরা বিপাকে পড়েছেন। সেই সাথে চিকিৎসক ও নার্সসহ হাসপাতালের স্টাফরাও।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, রোববার দুপুর ১২টার পর থেকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের লিফট বন্ধ হয়ে যায়। লিফট বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগী ও তার স্বজনদের মধ্যে দুশ্চিন্তা ভর করে। আতংক ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এদিকে হৃদরোগ ও দুর্ঘটনায় আহত রোগীদের পরীক্ষা নিরীক্ষাসহ জরুরী প্রয়োজনে ওঠানামা বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক হার্টের রোগী প্রয়োজনে তিনতলার উপরে উঠতে পারছেন না। আবার চিকিৎসকরাও ৬ তলা ও ৮ তলায় যেতে পারছেন না।

আসাদুজ্জামান নামে এক রোগীর স্বজন বলেন, ঝিনাইদহ আড়াই’শ বেড জেনারেল হাসপালের লিফট মানেই ছিল আতংক। আগে যখন তখন লিফট বন্ধ হয়ে রোগী ও তার স্বজনরা বিপদের সম্মুখিন হলেও কোন প্রতিকার ছিল না। কারণ এ দুটি লিফট চালান হাসপাতালেরই তিনজন সিকিউরিটি গার্ড। এ বিষয়ে তারা দক্ষ না হলেও তাদের হাতেই সোপর্দ করা হয়েছে আটতলা ভাবনের দুইটি লিফট। ফলে প্রতিনিয়ত লিফট আটকে রোগীদের বিড়ম্বনায় ফেলে দিত। এবার নষ্ট হয়ে ভোগান্তির চরম শিখরে পড়লো রোগীর পাশাপাশি ও তার স্বজনরা।

লিফট নষ্ট হওয়ার কথা স্বীকার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক সৈয়দ ডাঃ সৈয়দ রেজাউল ইসলাম জানান, বিষয়টি রোববার জেলা সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। মিটিংয়ে উপস্থিত ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ফারুক হোসেনকে অবহিত করে দ্রুত লিফটি মেরামতের জন্য বলা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক জানান, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালটি বহুতল বিশিষ্ট হওয়ায় লিফট খুবই জরুরী। প্রতিদিন রোগীসহ প্রায় ৮/৯’শ দর্শনার্থী লিফট ব্যবহার করেন। তাছাড়া তিন তলা ছাড়া লিফট ব্যাতিত উপরে যাওয়া কষ্টকর। বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে ফোন করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। অন্যদিকে উপ বিভাগীয় প্রকৌশলী ফারুক হোসেন ফোন রিসিভ করেননি।

এ ব্যাপারে হাসপাতালের ঠিকাদার সাইফুল ইসলাম টিপু জানান, লিফট কেনার জন্য গনপুর্ত বিভাগের তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার ইবনে শাইখ দুইবার ইটালি যান। তিনিই দেখে শুনে এই লিফট কিনে আনেন।

তাই লিফট নিয়ে প্রশ্ন উঠলে গনপূর্ত বিভাগ তার সমাধান করবেন।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ২০১৭ সালে টি.ই অ্যান্ড ইউসিসি জেভি নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নির্মাণকাজ শুরু করে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে ভবনটি হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু ঘুষ লেনদেন নিয়ে ঠিকাদারের সঙ্গে তৎকালীন নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার ইবনে শাইখের দ্বন্দ হলে ঠিকাদারের বিল আটকে দেন। এ নিয়ে বিরোধ চরমে ওঠে। দুদক বিষয়টি তদন্তে নামে। একপর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী কায়সার বদলি হয়ে যান।